Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXII, June 2015

আচার্য শান্তরক্ষিত ও তাঁর *মাধ্যমকালঙ্কার*

মো. জহির রায়হান*

[**সারসংক্ষেপ:** অষ্টম শতকের মহাযান বৌদ্ধ ধারার দার্শনিক শান্তরক্ষিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত যে মৌলিক গ্রন্থগুলো পাওয়া গেছে তার মধ্যে *মাধ্যমকলঙ্কার* প্রধান। বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে শান্তরক্ষিতের জন্ম, শিক্ষা ও তিব্বত গমন বিষয়ক অমীমাংসিত কিছু প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে *মাধ্যমকলঙ্কার*-এ শান্তরক্ষিতের দার্শনিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি নাগার্জুনের মাধ্যমিক মত অনুসরণ করেন এবং এই ধারার যোগাচারবাদ ও মাধ্যমিকবাদের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমন্বয় করতে গিয়ে শান্তরক্ষিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেন: যেমন– স্বসংবেদন তত্ত্ব, অর্থক্রিয়াত্ব তত্ত্ব, পারমার্থিক সত্যের পদ্ধতি বিষয়ক তত্ত্ব ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর এই দার্শনিক অবস্থানগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আগে তিব্বতে বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শান্তরক্ষিত (৭২৫-৭৮৮ খ্রী.) ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী বৌদ্ধ পণ্ডিত। শান্তরক্ষিত তিব্বতে বৌদ্ধমত প্রচারের আগে থেকেই তিব্বতীয়রা বৌদ্ধমতের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে এই পরিচিতি শুরু হয়। তিব্বতের সম্রাট স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো (Sron-btsan-sgam-po) (৬১৮–৬৫০ খ্রী.) নেপাল জয় করার পর নেপাল-রাজ অংশু বর্মার কন্যাকে বিয়ে করেন। নেপালের রাজকন্যা ভৃকুটি তিব্বতে নিয়ে আসেন বুদ্ধের প্রতিকৃতি। রাজা স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো চীনের একটা বড় অংশও জয় করেছিলেন এবং চীনা রাজকুমারী ওয়েন চেংকে (Wen Cheng) বিয়ে করেছিলেন। ওয়েন চেং তিব্বতে নিয়ে এসেছিলেন শাক্যমুনির তরুণ রাজকুমার মূর্তি। রাজা স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো তাঁর স্ত্রীদের উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এই রাজা ছিলেন তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রথম পৃষ্টপোষক রাজা। তিব্বতে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক পরিসরে বৌদ্ধমতের প্রসার ঘটে রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসানের মাধ্যমে। তাঁর আমন্ত্রণেই শান্তরক্ষিত তিব্বতে গিয়েছিলেন।

তিব্বতে বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠার আগে সেখানে যে ধর্মমতের প্রচলন ছিল তার নাম পোনধর্ম। প্রথমে এই ধর্ম সম্পর্কে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব যাতে শান্তরক্ষিত কোন ধর্ম-পরিস্থিতির ভেতর তিব্বতে পৌঁছান তা অনুধাবন করা যায়। তিব্বতের প্রাচীন পোন

* Md. Zahir Rayhan, Associate Professor, Department of Philosophy, Jahangirnagar University.

ধর্মের অনুসারীদের বলা হয় পোন-পো। রকফিল দাবি করেন যে, পোন-পা শব্দটি এসেছে পূণ্য থেকে (Alaka Chattopadhyaya 2011: 165)। তিব্বতে এখনো দেশটির দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এই প্রাচীন ধর্মমতকে অনুসরণ করেন। বৌদ্ধমত প্রচারের সময়ে প্রাচীন পোনধর্মের অনুসারীদের অনেকেই এই নতুন মতকে বৈরী দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন এবং এর বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে, পোনধর্মও ক্রমশ বৌদ্ধমত দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। তিব্বতে বৌদ্ধমত পোনধর্মের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউরোপে যেমন প্রাচীন প্যাগানিজমের স্থলে খ্রীস্টধর্ম সংস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দুটি ধর্মমতই পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে টিকে আছে (Alaka Chattopadhyaya 2011: 166)। অনেক পশ্চিমা গবেষক প্রাচীন পোনধর্মকে শমনবাদ ও সর্বপ্রাণবাদ বলে গণ্য করেন। শরৎ চন্দ্র দাসও এই ধর্মমতকে শমনবাদ বলেছেন (Alaka Chattopadhyaya 2011: 171)। এই ধর্মমতে রয়েছে মাতৃকা-প্রাধান্য। পুরুষ দেবতার চেয়ে এতে দেবীদের ভূমিকাই প্রধান। অবশ্য শান্তিপূর্ণ ও ক্রুদ্ধ এই দুধরনের দেবতাই রয়েছে পোনধর্মে। ক্রুদ্ধ দেবতার সঙ্গে শৈব মতের রুদ্র শিবের মিল পাওয়া যায়। আসলে শৈব ও শাক্তমত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে পোনধর্ম। তান্ত্রিকদের শৈব তত্ত্ব ঢুকে পড়েছে পোনধর্মে। পোনধর্মে আছে প্রাণী উৎসর্গের উপচার– পোন-পোরা দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে ভেড়া, কুকুর, বানর ইত্যাদি প্রাণী উৎসর্গ করেন। পোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গুনিনদের ডাকা হয়। এই গুনিনরা পাহাড়, সূর্য, চন্দ্র, তারা ও স্বর্গের দেবতাদের ডেকে আনেন। ইন্দ্রজাল এই ধর্মের প্রধান একটা অনুষঙ্গ। শরৎ চন্দ্র দাস বলেন, পোন ধর্মে আছে বস্তুকাম, দৈত্যপূজা এবং জাদুমন্ত্রের মাধ্যমে সন্তুষ্টিলাভ ইত্যাদি (Alaka Chattopadhyaya 2011: 166)। বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হয়ে গেলে এই ধর্মকে দেখা হতো পাষণ্ডদের মত হিসেবে, একই সঙ্গে এই ধর্মের অনুষ্ঠানাদিকে নিন্দনীয় গণ্য করা হতো। প্রাচীন চীনের তাও-বাদ পোনধর্মকে প্রভাবিত করেছে। তিব্বতীয়রা পোনধর্মের সঙ্গে শেনরাব মিওচে-র নামকে যুক্ত করেন। তিব্বতীয় পণ্ডিতদের কেউ কেউ তাও-বাদের প্রতিষ্ঠাতা লাও-ৎজের সঙ্গে শেনরাব মিওচে-কে অভিন্ন মনে করেন। তিব্বতে বৌদ্ধমত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধনীতি ও ভাব প্রাচীন এই ধর্মমতকে বদলে দিতে থাকে। পরিবর্তনের কোনো এক পর্যায়েই শেনরাব মিওচে-কে বুদ্ধের আদলে বদলে নেয়া হয়েছে। পোনধর্মের দেবীদের চেহারাও রূপ লাভ করেছে তিব্বতীয় বৌদ্ধ দেবীদের চেহারার আদলে। শরৎ চন্দ্র দাস তাঁর গ্রন্থে শেনরাব-এর যে বর্ণনা দেন তাতে বোঝা যায় যে তার উপর বুদ্ধের প্রতিরূপ আরোপ করা হয়েছে (Alaka Chattopadhyaya 2011: 167)। এই কাজটি তিব্বতীয় পোন-পোরাই করেছেন। পোনধর্ম সম্পর্কে দালাই লামা বলেন, শুরুতে, আমার বিশ্বাস এটি (পোনধর্ম) তেমন কোনো ফলপ্রসূ ধর্ম ছিল না, কিন্তু যখন বৌদ্ধমত তিব্বতে বিকশিত হওয়া শুরু করে পোনধর্মও তার নিজের ধর্মীয় দর্শন ও ধ্যানের সম্পদকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পায় (Dalai Lama 1962: 239)।

শান্তরক্ষিত বাংলা অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। তিব্বতীয় উৎসগুলো থেকে এমন তথ্যই পাওয়া যায়। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক সুমপা'র গ্রন্থাবলি সম্পাদনা করেন শরৎচন্দ্র দাস, ১৯০৮ সালে। সুমপা বলেছেন, শান্তরক্ষিত পূর্ববাংলার লোক ছিলেন এবং অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে রাজপরিবারে জন্মেছেন সেই একই পরিবারে জন্মেছিলেন শান্তরক্ষিত (Sum-pa 1908: 112)। অতীশের দুজন শিষ্য তিব্বতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে যাদের রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাঁরা হলেন, ব্রোম-স্টোন পা (Brom-ston-pa) ও নাগ-ৎসো (Nag-tsho)। ব্রোম-স্টোন পা তাঁর একটি স্রোত্রে বলেন, "I offer prayer to the feet of Dipamkara-sri, who was born in the noble Jiva family of the kings of *za-hor* of the *tri-sampanna* Bengal in the same line to which Santijiva (Santaraksita) belonged (Alaka Chattopadhyaya 2011: 56)। নাগ-ৎসো তাঁর একটি স্তোত্রে বলেন,

> In the east of India, in Za-hor,
> Is a wondrous and mighty city
> Known by the name Vikrama-pura
> At the centre of this royal city is a Splendid, majestic palace
> Known as the Palace of the Golden Banner.
> As for the wealth and prosperity of the city,...
> It is the second prince, Chandra-garbha
> Who became the illustrious master Atisa (Lama Tsong Khapa (1983: 2).

শান্তরক্ষিত বিষয়ক গবেষক জেমস ব্লুমেনথাল বলেন, পূর্ব-ভারতের বাংলা অঞ্চলের এক রাজ পরিবারে জন্ম শান্তরক্ষিতের (James Blumenthal 2004: 25)। শরৎ চন্দ্র দাস তাঁর *ইন্ডিয়ান পন্ডিতস ইন দ্য ল্যান্ড অফ স্নো* গ্রন্থে শান্তরক্ষিতকে বাংলার পণ্ডিত বলে উল্লেখ করেন (Sri Sarat Chandra Das (1893: 51)। রিচার্ড সেরবার্ন কৃত *কমপ্লিট ওয়ার্কস অব অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান* গ্রন্থে অতীশের জন্মস্থান সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি অতীশের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গ বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এ তথ্যের সমর্থনে তিনি কোনো তথ্যসূত্র হাজির করেননি (Richard Sherburne, S.J. 2000: xvi)। অতীশের *বোধিমার্গ-প্রদীপম-পঞ্জিকা-নাম* গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত অন্তশ্লোকে অতীশ দীপঙ্কর বাঙালি বলে উল্লেখিত হয়েছে (Richard Sherburne, S.J. 2000: 313)। তাওসোবুদ্ধ তাঁর *অতীশ: দ্য তিবেতান বুদ্ধিস্ট মাস্টার* (২০১০) গ্রন্থেও অতীশকে বাংলার পণ্ডিত হিসেবে উল্লেখ করেন (Taoshobuddha 2010: 14))। অলকা চট্টপাধ্যায় তিব্বতীয় উৎসগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অতীশ দীপঙ্করের পিতা বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। শান্তরক্ষিত ও অতীশের জন্ম যেহেতু একই রাজপরিবারে কাজেই শান্তরক্ষিত নিঃসন্দেহে বাংলাদেশেরই মানুষ ছিলেন।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন শান্তরক্ষিতের জন্মস্থান প্রসঙ্গে ভিন্নমত দিয়েছেন। তাঁর মতে, শান্তরক্ষিতের জন্ম অঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্তের অঞ্চল সা-হোরে। তিনি বলেন, "কোনো

কোনো তিব্বতী গ্রন্থে আবার সাহোরকে ভঙ্গল বা ভগল নামে অভিহিত করা হয়েছে" (রাহুল সাংকৃত্যায়ন ২০১১: ১১৮)। উল্লেখ্য যে রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর এই মতের পক্ষে কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। রাহুল আরও বলেন, "বিক্রমপুরীর অপর নাম হিসেবে বিক্রমপুর বা ভাগলপুরের উল্লেখও বিভিন্ন তিব্বতী গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। (রাহুল সাংকৃত্যায়ন ২০১১: ১১৮) এক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্যের পক্ষে কোনো তথ্যসূত্র নেই। অনুমান করা যায় যে, বাংলা বা বেঙ্গলকে তিব্বতীয় উচ্চারণে ভাঙ্গলা বলা হয়েছে যাকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন ভগল পাঠ করেছেন এবং ভাগলপুরের সঙ্গে তাকে অভিন্ন গণ্য করেছেন। এছাড়া বিক্রমপুরকে তিনি বিক্রমশিলার সঙ্গে অভিন্ন ধরে অতীশ দীপঙ্করকে ভাগলপুরের লোক গণ্য করেছেন। যেহেতু অতীশ ও শান্তরক্ষিতের জন্ম একই রাজপরিবারে কাজেই তিনিও শান্তরক্ষিতকে ভাগলপুরের লোক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

তিব্বতীয়রা শান্তরক্ষিতকে বলেন, শি-বা-ৎশো (Shi-ba-tsho), যার আক্ষরিক অর্থ শান্তিজীব। বুস্টোন (Bu-ston) ও সুমপা (Sumpa) শান্তরক্ষিতকে উল্লেখ করেছেন বোধিসত্ত্ব বলে। তিনি নালন্দায় সর্বাস্তিবাদী পণ্ডিত জ্ঞানগর্ভের নিকট প্রথম দীক্ষা গ্রহণের সময় বোধিসত্ত্ব শান্তরক্ষিত বলে ভূষিত হন (Jamgön Mipham 2005: 85)। তিব্বতের কোনো কোনো মন্দিরে তাঁর নাম লেখা আছে শান্তিপা বলে। পণ্ডিতদের কেউ কেউ এমন আশঙ্কা করেছেন যে, তেঞ্জুইরে এমন সব তান্ত্রিক গ্রন্থ শান্তরক্ষিতের নামে সংরক্ষিত আছে যা *তত্ত্বসংগ্রহ* ও *মাধ্যমকালঙ্কার*-এরলেখক শান্তরক্ষিতের পক্ষে রচনা করা বেমানান। এ কারণে তাঁরা একাধিক শান্তরক্ষিতের অস্তিত্বের অনুমান করেন। অলকা চট্টপাধ্যায় বিষয়টির একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে, তিব্বতীয় ইতিহাসবিদগণ চেনেন একজন শান্তরক্ষিতকেই। যিনি একইসঙ্গে যুক্তিবিদ ও তত্ত্বজ্ঞানী এবং তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। তিব্বতীয় উৎস ছাড়া যেহেতু আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্য কোনো অবলম্বন নেই কাজেই আমাদেরকে একজন শান্তরক্ষিতকে মেনে নেয়াই যুক্তিসংগত। আমরা জানি শান্তরক্ষিতের সহযোগী পদ্মসম্ভব ছিলেন একজন তান্ত্রিক সাধক। সেসময়ের তিব্বতীয় বৌদ্ধমতের উপর তন্ত্রের প্রভাব ছিল অত্যধিক। মহাযানী বৌদ্ধমত তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হওয়া শুরু করে অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর আমল থেকেই। এছাড়া শান্তরক্ষিত তন্ত্রবিষয়ক যে গ্রন্থগুলো রচনা করেন তা যথেষ্ঠ গভীর এবং দর্শন ভাবনায় উজ্জ্বল। ফলে শান্তরক্ষিতের নামে রচিত তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলো তাঁর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

শান্তরক্ষিত যুক্তিবিদ হওয়া সত্ত্বেও যদি তান্ত্রিকগ্রন্থগুলো লিখেও থাকেন, তথাপি তার পক্ষে যুক্তিনির্ভর গ্রন্থগুলো লেখা সম্ভব। তেমন উল্লেখ তিব্বতীয় উৎসগুলোতে রয়েছে। তবে তিনি তিব্বতীয় জনগণের কাছে তন্ত্রপূর্ব বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা দিতেন বলে অনুমান করা যায়।

রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসানের (Khri-sron-lde-btsan) সময়ে খুব ক্ষমতাবান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মা-শাং (Ma-shań)। বৌদ্ধধর্মের বিরোধী এই মন্ত্রী অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অন্য দেশে নির্বাসনে পাঠান এবং বৌদ্ধমূর্তিগুলিকে লাসা থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে

দেন নেপাল-সীমান্তবর্তী কিরং অঞ্চলে। তিনি বৌদ্ধ বিহারগুলোকে রূপান্তরিত করেন কসাইখানায়। রাজা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এসব কর্মকাণ্ড আটকাতে পারেননি। ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসানের আরেক মন্ত্রী সাল-নাং (gSal-snań) নেপাল ও বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণ করে বৌদ্ধ মতবাদের একজন অনুরাগীতে পরিণত হন। একারণে তিনি জ্ঞানেন্দ্র নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অতীশের শিষ্য ঐতিহাসিক গোস লো-ৎসাবা (Gos lo-tsā-ba)-এর দেয়া তথ্য অনুসারে, জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে শান্তরক্ষিতের সাক্ষাৎ হয় নেপালে। শান্তরক্ষিত নেপালে কেন কিভাবে গেছিলেন সে সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যায় না। তখনো বৌদ্ধমত বিরোধী মন্ত্রী মা শাং জীবিত। তবু মন্ত্রী জ্ঞানেন্দ্র রাজাকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন বাঙালি আচার্য শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান। যাতে তাঁর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পারে তিব্বতবাসী। বিচক্ষণ ও তরুণ রাজা তখন জ্ঞানেন্দ্রের কথার জবাবে তাকে সতর্ক করে দেন যে, একথা জানতে পারলে মা-শাং অবশ্যই শাস্তি দেবে সাল নাংকে। তবে তিনি এমন প্রতিশ্রুতিও দেন যে গোপনে অন্যান্য মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে উপাধ্যায়কে পত্র পাঠানো হবে (Alaka Chattopadhyaya 2011: 167: 223)।

শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তুতি চলছিল ভেতরে ভেতরে। অন্যদিকে, তাঁকে আনার বিরোধ মোকাবেলা কিভাবে করা যাবে সেই কৌশলও খুঁজে বের করা হচ্ছিল। যারা বৌদ্ধ মতের অনুসারী ছিলেন তাদের ভেতর থেকেই একটি কৌশলের উদ্ভাবন করা হয় যা প্রধানমন্ত্রী মা-শাং-এর করুণ মৃত্যু বয়ে আনে। গোস লো-ৎসা-বা বলেন, "তারপর গোস-র্গান (Gos-rgan) মা-শাং-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেন এবং পরে স্তোদ-লুংস (sTod-luńs)-এ একটি কবরে তাঁকে জীবন্ত সমাধিস্ত করা হয়" (Alaka Chattopadhyaya 2011: 224)। বু-স্টোনের লেখায় আছে, মন্ত্রী গোস-র্গান মা-শাংকে জীবন্ত কবরে ফেলে দেন এবং রন্ধ্রগুলো পাথর দিয়ে ঢেকে দেন। শরৎ চন্দ্র দাসও এ বিষয়ে আলোকপাত করেন তার গ্রন্থে। মা-শাংকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে একটি গল্প সাজানো হয়। এই পরিকল্পনাটি করা হয় রাজার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে। জ্যোতিষ ও ভবিষ্যৎ কথকদের উৎকোচ দিয়ে বলানো হয় যে, রাজার উপর বিপদ আসন্ন। এই বিপদ থেকে বাঁচার একটি উপায় আছে। সেটি হলো রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ দুজন ব্যক্তিকে ঢুকতে হবে কবরতুল্য একটি ঘরে এবং তাদেরকে সেখানে থাকতে হবে একটানা তিন মাস ধরে। যারা এই মহৎ কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করবেন রাজা তাদের জন্য অনেক পুরস্কার ঘোষণা করেন। মন্ত্রী গোস-র্গান এতে নিজের সম্মতির কথা ঘোষণা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী মা-শাংও এতে রাজি হয়ে যান। একটা কবরতুল্য প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয় মাটির নিচে। এটি ছিল ৩জন মানুষের দৈর্ঘ্যের সমান গভীর। দুজনে মাটির সেই ঘরে প্রবেশ করার পর মধ্যরাতে গোস-র্গানের এক বন্ধু একটি দড়ি নামিয়ে দেন সেই প্রকোষ্ঠে। দড়ি ধরে উঠে আসেন মন্ত্রী গোস-র্গান। আর দুর্ভাগা মন্ত্রী রয়ে যান সেই নির্জন প্রকোষ্ঠের ভেতর আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। তাঁর শত্রুরা এরপর বড়

বড় পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেন প্রকোষ্ঠের মুখ। মা-শাংয়ের করুণ মৃত্যুর পর শান্তরক্ষিতকে আমন্ত্রণ পাঠানো হয় তিব্বতে আসার।

নীল বর্ষপঞ্জি নামে এক গ্রন্থে কিংবদন্তীর একটি গল্প আছে আচার্য শান্তরক্ষিতকে নিয়ে। এই কিংবদন্তী অনুযায়ী, বুদ্ধ যে আমলে কশ্যপ মুনি রূপে জন্মেছিলেন, সেই আমলে এক হাঁস-মুরগীর খামারীর তিন পুত্র ছিল। সেই তিন পুত্র পরস্পরের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, পরবর্তী কোনো জন্মে তাঁরা তিব্বতে বৌদ্ধর্ধম প্রচার করবেন। এই তিনজনের একজন ছিলেন আচার্য শান্তরক্ষিত এবং অন্য দুজন ছিলেন রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসান (৭৪০-৭৯২) ও মন্ত্রী সাল নাং। এই কিংবদন্তী থেকে শান্তরক্ষিতের আবির্ভাব কাল ও তিব্বতে তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

শান্তরক্ষিত রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসান ও মন্ত্রী সাল-নাং এর সময় দুবার তিব্বতে গমন করেন। তাঁর তিব্বতে যাবার ব্যাপারে মন্ত্রী সাল-নাংয়ের ভূমিকাই ছিল প্রধান। *নীল বর্ষপঞ্জি*র কিংবদন্তী থেকেও এই মন্ত্রী ও রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসানের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিংবদন্তীর গল্পটিতে এমন বর্ণনা আছে যে, তিব্বতে আসার পর শান্তরক্ষিত যখন রাজার সামনে উপস্থিত হন তখন রাজা তাঁর পূর্বজন্মের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করতে পারেননি। পরে শান্তরক্ষিত যখন তাঁর মহিমাকীর্তন করতে থাকেন তখন তিনি পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনাই স্মরণ করতে পেরেছিলেন।

শান্তরক্ষিতকে আমন্ত্রণ জানানোর পূর্বে রাজা নিজে এই উপাধ্যায়ের প্রকৃত পরিচয়ের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। কাজেই কিছু সংশয় ছিল তাঁর মনে। তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তিনি তিন জন তিব্বতীয়কে পাঠান তাঁর ব্যাপারে খোঁজ-খবর করতে। কিন্তু তাঁরা শান্তরক্ষিতের ভাষা বুঝতে না পারায় কিছুই স্থির করতে পারেন নি। পরে অনন্ত নামে এক কাশ্মিরীকে তাঁরা দোভাষী হিসেবে নেন। অতঃপর শান্তরক্ষিতের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন, তিনি সদ্গুণ সম্পন্ন এবং তাঁর মধ্যে অসংগত কিছুই নেই। তখন তাঁরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। শান্তরক্ষিত বিষয়ে রাজার অবহিত হওয়া সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। গোস লো-ৎসাবার বর্ণনাটি এ রকম: রাজা তাঁর মন্ত্রীদের হুকুম করলেন এই শিক্ষকের তত্ত্ব ও চরিত্র পরীক্ষা করতে যে আসলেই তিনি সদ্গুণ সম্পন্ন কিনা। মন্ত্রীরা উপস্থিত হলেন উপাধ্যায়ের কাছে এবং জিগ্যেস করলেন, "আপনার তত্ত্ব কী প্রকারের?" উপাধ্যায় বললেন, "আমার তত্ত্ব হলো, যুক্তি দিয়ে পরীক্ষা করার পর যা সঠিক প্রমাণিত হয় তা অনুসরণ করা এবং যুক্তিরহিত যা কিছু তা বর্জন করা" ((Alaka Chattopadhyaya 2011: 232)। *তত্ত্বসংগ্রহ* ও *মাধ্যমকালঙ্কার*-এর লেখক শান্তরিক্ষতের পক্ষে এই জবাবটিই যেন সবচেয়ে মানানসই ছিল। তবে এ প্রশ্নটি যথার্থ যে, তন্ত্রমন্ত্র জাদুবিদ্যায় আচ্ছন্ন তিব্বতীয় জনগণ তাঁর এই জবাবকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল। হয়তো বৌদ্ধমত বিষয়ে যে সমস্ত তিব্বতীয় নমনীয় ছিলেন তাঁরা একে নতুন সময়ের সম্ভাবনা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। পোনধর্মের অনুসারীদের পক্ষে এই যৌক্তিক অবস্থানকে মেনে নেয়া খুব স্বাভাবিক নয়।

তিব্বতে শান্তরক্ষিতের প্রথম সফর খুব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। তাঁর আগমনের পরই তিব্বতে নানা বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। প্লাবন, শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। নিছক এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন প্রতিপক্ষরা। বৌদ্ধধর্মের বিরোধী এই প্রতিপক্ষরা প্রচার করতে থাকেন, তিব্বতে নতুন ধর্মমত প্রচার করার কারণেই দেব-দেবীরা অখুশী হয়েছেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। যদি বাঙাল পণ্ডিতকে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয় তবেই এই দুর্যোগের অবসান হবে। এসব কথা শুনে বিরক্ত হয়ে শান্তরক্ষিত তিব্বত ত্যাগ করেন। এই প্রথম পর্যায়ে তিনি তিব্বতে ছিলেন মাত্র চার মাস। এই ঘটনার পর শান্তরক্ষিত রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসানকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর পরামর্শে রাজা পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ জানান যিনি ছিলেন একজন তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিত। পদ্মসম্ভব সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, তিনি তিব্বতে গিয়ে যুদ্ধ করে এসব দেও-দানবকে পরাস্ত করেন। পদ্মসম্ভব এই পোন-ধর্মীয় দেব-দেবী, ডাকিনী-যোগিনী, ভূত-প্রেতদেরকে কেবল পরাস্তই করেন না, তাদেরকে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিতও করেন। অর্থাৎ যারা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কারণে ক্রুদ্ধ ছিলেন, পদ্মসম্ভবের কারণে তারা নিজেরাই বৌদ্ধমত গ্রহণ করে ফেলেন। পদ্মসম্ভব ছিলেন শান্তরক্ষিতের ভগিনীপতি। তিনি ছিলেন মন্ত্রযান ও তন্ত্রের শিক্ষক। অন্যদিকে, শান্তরক্ষিত ছিলেন দর্শন ও সূত্রযানের শিক্ষক। পদ্মসম্ভবের কারণেই তিব্বতে শান্তরক্ষিতের পুনরাগমনের ক্ষেত্র প্রস্তূত হয়। পুনরায় আমন্ত্রণ জানানো হয় শান্তরক্ষিতকে। দ্বিতীয় দফায় তিব্বতে গিয়ে শান্তরক্ষিত ছিলেন পনের বছর, তাঁর মৃত্যুকাল অবধি।

শান্তরক্ষিত বৌদ্ধমতের যে সমস্ত তত্ত্ব তাঁর ব্যাখ্যা তিব্বতীয় জনগণের সামনে হাজির করেন তা একটি প্রভাবশালী ধারায় পরিণত হয় বিশেষত অষ্টম-নবম শতকের মধ্য তিব্বতে। তাঁর একটি প্রধান কাজ ছিল মহাযান বৌদ্ধমতের প্রধান দুটি ধারা যোগাচারবাদ ও মাধ্যমিকবাদের মধ্যে যৌক্তিক সংগতিবিধান করা। এছাড়াও তিনি নাগার্জুনের সারসত্তাবিরোধী মতবাদের সঙ্গে দিগনাগ (৬ষ্ঠ শতক) ও ধর্মকীর্তির (৭ম শতক) যৌক্তিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। ধর্মকীর্তির একজন গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যকার ছিলেন তিনি। তিব্বতে লামাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আশ্রমভিত্তিক সংঘ ও শিক্ষণব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিব্বতে শান্তরক্ষিত প্রচার করেন মাধ্যমিক ধারার বৌদ্ধমত। তাঁর মতকে তিব্বতে বলা হয়েছে যোগাচার-স্বাতন্ত্রিক-মাধ্যমিক বৌদ্ধমত। বাস্তবতার প্রকৃতি বিষয়ে বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা হাজির করেন শান্তরক্ষিত। তিব্বতে তিনি বৌদ্ধমতের আবশ্যকীয় তত্ত্বগুলো যেমন দশ-কুশল, দ্বাদশ নিধান, আর্যসত্য, অষ্টমার্গ ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন এমন অনুমান করা হয়। বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থকে তিব্বতী ভাষায় ভাষান্তরিত করেন তিনি। যদিও গ্রন্থগুলির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই বর্তমানে পাওয়া যায়। তিব্বতে শান্তরক্ষিতের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে রয়েছে ৭জন ভিক্ষুকে গড়ে তোলা এবং সম-য়ে (bSam-ya)

বিহার প্রতিষ্ঠা করা। এটিই তিব্বতের প্রথম বিহার। শান্তরক্ষিত ছিলেন এই বিহারের প্রথম আচার্য। একারণেই তিব্বতীয়রা তাকে খেনচেন বলে ডাকেন যার অর্থ মহান অধ্যক্ষ।

সম-য়ে বিহার নির্মিত হয় লাসা থেকে দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে। এই বিহার নির্মাণে সময় লাগে বারো বছর। ভারতের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে তৈরি করা হয় এই বিহার। এর আছে বারোটি অঙ্গন। সম-য়ে বিহারের জন্য ভারতবর্ষ থেকে আনা হয় বারো জন সর্বাস্তিবাদী পণ্ডিতকে। আচার্য শান্তরক্ষিত এই বিহারের নৈতিক ও শৃঙ্খলার দিকটি দেখতেন আর তাঁর সহযোগী পদ্মসম্ভব দেখতেন বৌদ্ধসাধনার তান্ত্রিক দিক।

শান্তরক্ষিত তিব্বত থেকে নেপালে ফিরে যাবার কিছুদিন পর চীনের সঙ-শী (*Saṅ-śi*) প্রদেশ থেকে কয়েকজন বৌদ্ধ পণ্ডিত লাসায় এসে বৌদ্ধমত প্রচার করতে থাকেন। তরুণ রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসানের উপরও তাদের একটা প্রভাব ছিল। চীনা মিশনারীরা মহাযান মতের যে বৌদ্ধমত তিব্বতে প্রচার করতে থাকেন তার থেকে শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের যোগাচারী-মাধ্যমিক মত ছিল স্বতন্ত্র। ফলে ভারতীয় বৌদ্ধমত ও চীনা বৌদ্ধমতের ভেতর একটা বিতর্কের উদ্ভব হয়। চীনা হোস্যাং (*Ho-shang*)র আলোচ্য ছিল ধর্মীয়-আধিবিদ্যক বিষয়। শান্তরক্ষিত রাজা ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসানকে অনুরোধ করলেন মগধ থেকে কমলশীলকে আমন্ত্রণ জানাতে। ইতোমধ্যে কমলশীলের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। রাজা কমলশীলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিব্বতে আনলেন। চীনা মহাযানী মতের সঙ্গে ভারতীয় যোগাচার-মাধ্যমিক ধারার ভেতর বিতর্কের আয়োজন করা হলো প্রকাশ্য দরবারে। তাতে কমলশীল বিজয়ী হলেন। তিনি রাজার কাছ থেকে লাভ করলেন লরেল পাতার মুকুট। কমলশীলকে সম-য়ে বিহারের আধিবিদ্যক শাখার প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করা হলো এবং চীনা মিশনারীদেরকে ফেরৎ পাঠানো হলো তাঁদের দেশে।

শান্তরক্ষিত তিব্বতে মৃত্যুবরণ করেন ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর দেহাবশেষ আজও সংরক্ষিত আছে সম-য়ে বিহারের অভ্যন্তরে এক চৈত্যের মধ্যে। মৃত্যুর পর সম-য়ে বিহারের পূর্বদিকে এক পাহাড়ের সানুদেশে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। যদিও ভারতীয় প্রথায় মরদেহ পুড়িয়ে ফেলারই নিয়ম, কিন্তু তেমনটা করা হয়নি। তিব্বতীয় পদ্ধতিতে তাকে সমাহিত করা হয়। সম্প্রতি সমাধিস্তূপটি ভেঙে পড়ায় সেখানে আচার্যের করোটি ও অস্থি-পঞ্জর বেরিয়ে পড়লে তা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয় বিহারে।

তিব্বতীয়রা পদ্মসম্ভবকে যতটা মনে রেখেছেন ততটা সম্মান শান্তরক্ষিতের স্মৃতির প্রতি দেখাতে পারেননি। কেবল বড় গুম্ফা আর বিহারগুলি ছাড়া কোথাও শান্তরক্ষিতের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ পদ্মসম্ভবের মূর্তি বা প্রতিকৃতি তিব্বতীয় জনগণের ঘরে ঘরে খুঁজে পাওয়া যায়। এর কারণ হিসেবে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন, শান্তরক্ষিতের রচনা থেকে "ভূত-প্রেত যাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের আগ্রহের নিবৃত্তি ঘটেনি। মনে হয় পদ্মসম্ভব সেই আগ্রহের অনেকটাই মেটাতে পেরেছিলেন" (রাহুল সাংকৃত্যায়ন ২০১১

: ১২৩)। শান্তরক্ষিত প্রথম তিব্বতে বৌদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত করেন। তিব্বতীয়দের পক্ষে সেই ইতিহাস বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। তাই নানা প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিতের স্মৃতি ফিরে আসে। তেমনই একটি গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন অলকা চট্টপাধ্যায় যাতে শান্তরক্ষিত ছাড়াও পদ্মসম্ভব, কমলশীল, রাজা ত্রি-স্র-দেউ-ৎসানকে একসঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে (Alaka Chattopadhyaya 2011: 212):

তখন জিন-বুদ্ধের সহকারী, পুণ্যাত্মা শি-বা-ৎসো (শান্তরক্ষিত)
আর অবতারদের সদ্গুরু, তপস্বী পদ্ম-বিয়ুং (Padma-'byuń) (পদ্মসম্ভব)
কমলশীল, জ্ঞানীদের মুকুট-রূপ অলঙ্কার,
আর ত্রি-স্রং-দেউ-ৎসান, উত্তম চিন্তার ধারক;
এই চারজনের ভেতর দিয়ে, যেভাবে অন্ধকার তিব্বতের দেশে সূর্যোদয় হয়,
তেমনি ধর্মের পুণ্য আলো ছড়িয়ে পড়ে দূর সীমান্তে;
নিত্য সহৃদয়তার পুণ্যাত্মা হে স্বজনেরা
সমস্ত তিব্বতবাসী তোমাদের শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানাবে চিরকাল।

শান্তরক্ষিতের মাধ্যমিকবাদ

মাধ্যমিকবাদ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র ও নাগার্জুন প্রবর্তিত শূন্যবাদের উপর ভিত্তি করে। এ মতবাদ অনুযায়ী, কোনো প্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত সত্তা বা কোনো সারসত্তা (essence) নেই। সমস্ত প্রপঞ্চই পারমার্থিক বিচারে শূন্যস্বভাবের (James Blumenthal, 2004:23)। অন্যদিকে, প্রপঞ্চসমূহের কেবল আছে ব্যবহারিক বা প্রথাগত সত্যতা। এ ব্যবহারিক সত্যতার উৎস দ্বৈততাসূচক মন (James Blumenthal, 2004: 210)। যেহেতু এ মতধারা অনুসারে বস্তু প্রপঞ্চ এক অর্থে নেই এবং অন্য অর্থে আছে– এরূপ মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করার কারণেই তাঁরা মাধ্যমিক।

মাধ্যমকালঙ্কার গ্রন্থটি দর্শনের ক্ষেত্রে শান্তরক্ষিতের মৌলিক অবদানসমূহকে ধারণ করে আছে। তাঁর প্রধান অবদানগুলির মধ্যে রয়েছে মহাযান মতের দুটি ধারা যোগাচারবাদ ও মাধ্যমিকবাদের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সাধন করা। এছাড়া তিনি নাগার্জুনের সারসত্তাবিরোধী মতবাদের সঙ্গে দিগনাগ (৬ষ্ঠ শতক) ও ধর্মকীর্তির (৭ম শতক) যৌক্তিক জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তা ও যোগাচারী বিজ্ঞানবাদের সংগতিপূর্ণ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি স্বসংবেদনের তত্ত্ব দেন যাতে তিনি বলেছেন, চেতনা চেতন হওয়া বিষয়ে সচেতন এবং চেতনা চেতনার বস্তু থেকে একবারে আলাদা কিছু নয়। কোনো মাধ্যমিক দার্শনিকরা এ বিষয়ে আলোকপাত না করলেও শান্তরক্ষিত স্বসংবেদন বিষয়ে তাঁর যৌক্তিক অবস্থান গ্রহণ করেন।

শান্তরক্ষিতের প্রধান তিব্বতীয় ভাষ্যকার জামগন মি-ফামের মতে *মাধ্যমকালঙ্কার*-এ ৫টি অবস্থান মাধ্যমিক দার্শনিকদের মধ্যে শান্তরক্ষিতকে অনন্যতা দিয়েছে (Jamgön Mipham 2005: 122):

১. কেবল বিশেষ সত্তা যাদের কার্যকারিতা আছে তারাই জ্ঞানের বৈধ মাধ্যম বা প্রমাণের বস্তু।
২. বস্তু নয়, মানস চেতনা আত্মবাচকভাবে (reflexively) জ্ঞানীয় ও আলোকময়।
৩. চিত্তমাত্র ধারা (mind-only system) অনুসরণে, অন্তর্বতী সত্তা সমূহের বিচিত্র উপস্থিতিকে স্বীকার করা যা কারো অভিজ্ঞতাবলে হাজির হয়।
৪. চূড়ান্তসত্যকে দুভাগে ভাগ করা: আসন্ন পরমার্থ সত্য (approximate ultimate truth) ও অন্তর্বর্তী পরমার্থ সত্য (ultimate truth in itself)।
৫. চূড়ান্তসত্যের আসন্ন রূপের সঙ্গে জ্ঞানের বৈধ উপায় বা প্রমাণের বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো স্ববিরোধ ঘটে না।

শান্তরক্ষিত *মাধ্যমকালঙ্কার* রচনাটিতে যোগাচার মত বা বিজ্ঞানবাদী মতের সঙ্গে মাধ্যমিক মতের সমন্বয় করলেও মাধ্যমিক মত তথা নাগার্জুনের সারসত্তাবিরোধী অবস্থানকেই সমুন্নত করেছেন। এই অবস্থানের সংগেই দিগনাগ ও ধর্মকীর্তির যৌক্তিক জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারাকে সমন্বিত করেন তিনি। যোগাচারবাদ চেতনার বাইরে বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই অবস্থানকে শান্তরক্ষিত মেনে নেন। কারণ এটিই সংবৃতি সত্য সম্পর্কিত মাধ্যমিক অবস্থান। দার্শনিক পদক্ষেপ হিসেবে এটাই যৌক্তিক। বস্তুর সারসত্তাহীনতার তত্ত্ব মেনে নিয়ে শান্তরক্ষিত যৌক্তিক পন্থায় দেখান যে, প্রত্যক্ষকারী হিসেবে মনেরও স্বাধীন বা নিত্য অন্তঃপ্রকৃতি নেই, অর্থাৎ মনও সারসত্তাহীন।

যোগাচারবাদ ও মাধ্যমিকবাদের সমন্বয়

মাধ্যমকালঙ্কার-এ শান্তরক্ষিত সারসত্তাবিরোধী অবস্থান তুলে ধরতে প্রথমে বিজ্ঞানবাদীদের অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তাদের যুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাহ্যবস্তু যে চেতনা-নির্ভর এবং তার যে নিজস্বতা বা অন্তর্নিহিত সত্তা নেই তা স্বীকার করে নেন। অতঃপর তার নিজস্ব যুক্তিপদ্ধতির আলোকে দেখান যে, চিত্ত বা মনেরও স্বভাব বা অন্তঃপ্রকৃতি নেই। তিনি বলেন, চিত্তমাত্র ধারার (conaciousness-only system) উপর নির্ভর করে জানা যায় যে, বাহ্যবস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এবং এই (মাধ্যমিক) ধারার জ্ঞানকে নির্ভর করে জানা যায়,

> কোনো ব্যক্তিসত্তারও (self) আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই, এমনকি অস্তিত্ব
> নেই ওই চিত্তেরও (*মাধ্যমকলঙ্কার*, সূত্র: ৯২)।

ব্যবহারিক জগতের শূন্যস্বভাব ব্যাখ্যা করতে শান্তরক্ষিত না-এক না-বহু যুক্তিটি ব্যবহার করেন। এই যুক্তিতে তিনি বলেন, সব ব্যক্তি ও প্রপঞ্চই স্বভাবের দিক থেকে শূন্য। কেননা তাদের একত্বের কোনো স্বভাব নেই, তেমনি বহুত্বের স্বভাবও নেই। অর্থাৎ তারা না-এক না বহু। কোনো প্রপঞ্চের সম্ভাব্য এই দুটি বিকল্প কোনো প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না।

এই যুক্তির বিশ্লেষণে শান্তরক্ষিত দেখিয়েছেন, আমরা যে পারিপার্শ্বিক বস্তুর জগতে বাস করি সেসব বস্তু সম্পর্কে অনেক বৌদ্ধ যেমন তেমনি অবৌদ্ধরাও মনে করেন যে, সে সবের নিজস্ব স্বভাব বা সারসত্তা আছে। এসব বস্তুর যে সারসত্তা নেই তা দেখাতে শান্তরক্ষিত *মাধ্যমকলঙ্কার*-এর প্রথম ৫৯টি স্তবক রচনা করেন। এতে তিনি অন্বেষণ করেন পারিপার্শ্বিক সত্তাগুলোর মধ্যে এমন কোনো স্বভাব আছে কিনা যাকে সত্যিকারভাবে একক বা অনন্য বলা যায়। অতপর ৬১ নম্বর স্তবকে তিনি যুক্তি দেন যে, এমন কোনো সত্তা নেই সত্যিকারভাবে যার অনন্য বা একক স্বভাব আছে, কাজেই এমন কোনো সত্তাও থাকতে পারে না যা স্বভাবগতভাবে বহু। কারণ বহুত্ব নির্ভর করে সত্যিকার এককগুলোর উপর। অর্থাৎ বহু মানেই অনেকগুলো এক। এক-ই যদি না থাকে তবে বহু কি করে থাকতে পারে। পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলোর যদি নিজের নিজের সত্তারূপ থাকতো তাহলে দেখানো যেত যে সেই অন্তর্নিহিত স্বভাব হয় অনন্য নয়তো বহুত্বজ্ঞাপক। অতঃপর শান্তরক্ষিত দেখান, পারিপার্শ্বিক সত্তাগুলো স্বভাবগত দিক থেকে শূন্য; আসলে এদের চূড়ান্ত কোনো সারসত্তা নেই।

শান্তরক্ষিত একক বা অনন্য বলতে বুঝিয়েছেন এমন কিছু যার কোনো অংশ নেই। যেমন, গাছ বলে কোনো পারিপার্শ্বিক বস্তুকে যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখি তবে দেখব শিকড়, কাণ্ড, ডাল, পাতা ইত্যাদি। কোনোভাবেই গাছের স্বভাব হিসেবে অনন্য কিছুকে আমরা পাব না। আর একক কিছু নেই বলেই বহু বলেও কিছু আমরা পাব না। শান্তরক্ষিত এই যুক্তিতে প্রথমে এককত্বের স্বভাবকে অস্বীকার করে দ্বিতীয়ত বহুত্বের স্বভাবকে অস্বীকার করেন। এই যুক্তির মাধ্যমে নিত্য ও অনন্য সত্তার ধারণা এবং স্বসম্ভূত সত্তার ধারণা অস্বীকৃত হয়। স্বসম্ভূত সত্তা মানে যা চূড়ান্ত কিন্তু নানা কার্য উৎপাদন করে। শান্তরক্ষিত সাংখ্যদের প্রকৃতি নামক নিত্য সত্তার ধারণাকে খারিজ করতে এই যুক্তি দিলেও এই যুক্তির মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক সমস্ত সত্তার সারসত্তাই অস্বীকৃত হয়। প্রমাণিত হয় যে বিশ্বসংসারে কোনোকিছুরই অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বা স্বভাব নেই।

পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সত্তার ভেতর যদি কোনো নিত্য স্বভাব থাকতো তবে সময়ের অধীন হয়ে বস্তুসমূহের ক্রমিক উদ্ভবের ব্যাপারটি ঘটতো না। অন্যথায় ক্রমিক উদ্ভবের ফলে যে কার্যগুলির জন্ম হতো তাতে নিত্য কারণটি সহঅবস্থান করতো। কেননা নিত্য হলে তার ফলাফলও নিত্য হবারই কথা। যেহেতু কারণের ভেতর কোনো বিরাম ঘটলে তাকে আর নিত্য বলা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা সংসারকে উদ্ভব ও বিলয়ের ভেতর আন্দোলিত হতে দেখি। সমস্ত কিছু বদলে যেতে থাকে।

শান্তরক্ষিত তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ *মাধ্যমকালঙ্কারবৃত্তি*-তে যুক্তিটিকে আরো বিস্তৃত করেন, তিনি বলেন,

> "গাছের ফল ধরতে দেরি হয় তখনই, যখন ফল ধরার কারণের পূর্ণতা না ঘটে। তাহলে, কারণের কার্যকারিতা যদি অবাধ হয়, তবে কার্যরূপ ঘটনাবলির ক্রমিক উদ্ভব কি করে সম্ভব?" (মাধ্যমকলঙ্কারবৃত্তি, ২১)

যুক্তিটি এরকম যে, যদি আদি কারণ কর্তারূপে অনন্য ও একই সঙ্গে বাধামুক্ত হয়ে থাকে তবে কার্য-ঘটনাবলির কালিক উদ্ভব অসম্ভব। যেহেতু আদি কারণে এমন কোনো অসম্পূর্ণ কারণ নেই যা ঘটনার উৎপাদনকে অপেক্ষা করিয়ে রাখে বা দেরি করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কার্যগুলোর উদ্ভবও ঘটার কথা নয়। যেহেতু আদি কারণ সব সময় একই এবং সদাবর্তমান। একটি অনন্য কারণ থেকে বিচিত্র ফলাফলের উদ্ভব হওয়াও যুক্তিসংগত নয়। কাজেই সত্তার ভেতর নিত্যরূপ বলে কিছু নেই।

শান্তরক্ষিত প্রপঞ্চের স্ব-স্বভাব বা নিত্য প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন, আবার প্রপঞ্চের ব্যবহারিক বা প্রথাগত অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। একারণেই তিনি মাধ্যমিক। আবার, তিনি এমন অবস্থানও নেন যে, ব্যবহারিক সত্তাগুলো এমন সত্তা নয়, যা মন থেকে একদম আলাদা। অন্যদিকে তিনি চেতনার আত্মবাচকতাও (reflexivity) স্বীকার করেন। এ দুটি অবস্থানই যোগাচারবাদের প্রধান মত। তিনি এই অবস্থানগুলোর ভেতর যৌক্তিকভাবে সংগতিবিধান করার মাধ্যমে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থানকে চিহ্নিত করেন।

দুই প্রকার সত্য সম্পর্কে শান্তরক্ষিত *মাধ্যমকালঙ্কার*-এর ৯১ স্তবকে বলেন, "যা কিছু কারণ ও কার্য তার সবই নিছক চেতনামাত্র।" তাঁর মতে, সংবৃতি বা ব্যবহারিক সত্য হলো এমন কিছু যা ক্ষণস্থায়ী বা কার্যকরী এবং শর্তনির্দিষ্টভাবে সৃষ্ট (অর্থাৎ কার্য ও কারণ রূপে থাকে)। মনের প্রকৃতি এ রকম। শান্তরক্ষিত যেহেতু পরম প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন, সেদিক থেকে তিনি মাধ্যমিক। আবার, ব্যবহারিক সত্য প্রকাশে তাঁর অবস্থান যোগাচারী। কাজেই এমন বলা যায় যে, পরম সত্য প্রকাশে শান্তরক্ষিতের দৃষ্টিকোণ মাধ্যমিকের আর ব্যবহারিক সত্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিকোণ যোগাচারী।

শান্তরক্ষিত যোগাচার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহারিক/সংবৃতি সত্যকে উপস্থাপন করেন *মাধ্যমকালঙ্কার*-এর প্রথম অংশে এবং যোগাচারী অবস্থান থেকে দেখান যে বস্তু-প্রপঞ্চের ভেতর কোনো সারসত্তা নেই, সবই মননির্ভর। কিন্তু এই রচনার শেষাংশে মাধ্যমিক অবস্থান গ্রহণের সময় তিনি দেখান যে, চেতনা বলতে যা আমরা বুঝি তারও কোনো সারসত্তা নেই।

মাধ্যমকালঙ্কার রচনায় শান্তরক্ষিত একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন, সেটা হলো এক মতের যুক্তি দিয়ে অন্য মত খারিজ করা এবং একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যৌক্তিক একটি অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়া। এই প্রক্রিয়ায় তিনি সৌত্রান্তিক মতের পক্ষ নিয়ে অবৌদ্ধ ও বৈভাসিকদের মত খারিজ করেন। এতে সৌত্রান্তিকদের মতোই স্বাধীন অনুমানের (autonomous inference) পদ্ধতি গ্রহণ করে প্রতিপক্ষকে সৌত্রান্তিক অবস্থান গ্রহণে প্রণোদিত করেন। আবার, যোগাচারী অবস্থান থেকে খারিজ করতে অগ্রসর হন সৌত্রান্তিক মত এবং এভাবে তিনি খণ্ডনও করেন সৌত্রান্তিক মত। ফলে, তাঁর যোগাচারী অবস্থান আসলে চূড়ান্ত অবস্থান নয়, তা কেবল সৌত্রান্তিক মত খারিজ করার একটি কৌশল। আবার, বাহ্যবস্তুর স্ব-স্বভাব অগ্রাহ্য করতেও তিনি যোগাচারী

যুক্তিপদ্ধতিকে কাজে লাগান। আর, চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি মাধ্যমিক অবস্থানকে সংহত করেন। এক্ষেত্রে আরেকবার তিনি দৃষ্টিকোণের বদল ঘটান। যোগাচার মত বিষয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। এই প্রশ্ন তোলার ভেতর দিয়ে তিনি মাধ্যমিক মতের দিকে অগ্রসর হন। তিনি বলেন,

> যদিও তাদের (যোগাচারী) মতের সুকৃতি আছে,
> আমাদের ভাবতে হবে, এমন কিছুর (যেমন প্রতিরূপ, যা চেতনা দ্বারা জ্ঞাত, যোগাচারীরা যাকে স্বীকার করেন)
> অস্তিত্ব আছে কিনা অথবা যদি তা কিছু হয়ও,
> আমরা ব্যাখ্যা না করে তা স্বীকার করে নিই (মাধ্যমকালঙ্কার ৪৫)।

*মাধ্যমকালঙ্কারবৃত্তি*তে শান্তরক্ষিত বলেন,

> "এই মতধারার (যোগাচার) উপর ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা 'আমি' 'আমার' এবং 'বস্তু' ও বস্তুর বোদ্ধার (জ্ঞাতা) মতো বিভেদাত্মক ত্রুটিপূর্ণ ধারণাগুলোকে বর্জন করেছে। যাহোক, এখানে মতধারা সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধানের দরকার আছে। এসব প্রতিরূপ (চেতনা দিয়ে যাকে জানা যায়) কি বাস্তব? কিংবা এদেরকে কি ব্যাখ্যা না করেই স্বীকার করে নেয়া যায়, যেমনটা আয়নার প্রতিবিম্ব?" (*মাধ্যমকালঙ্কারবৃত্তি* ৬০-৬১)

শান্তরক্ষিত এই পর্যায়ে তাঁর চূড়ান্ত অবস্থান, অর্থাৎ মাধ্যমিক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পূর্ববর্তী অবস্থানগুলির ব্যাপারে বৈচারিক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেসবের বিরুদ্ধে যুক্তি দেন। এই চূড়ান্ত অবস্থানে এসে তিনি সংবৃতি সত্যের সংজ্ঞায় যোগাচারবাদকে সমন্বিত করেন।

স্বসংবেদন তত্ত্ব

স্বসংবেদন কথাটির অর্থ চেতন হবার জন্য সচেতনতা অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। শান্তরক্ষিতের মতে, চেতনা মাত্রই স্বসংবেদনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত– চেতনা নিজের সম্পর্কে এবং তার জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন। এটাই চেতনার আত্মবাচকতা (reflexivity), চেতনার মধ্যে কোনো জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বিভাজন নেই (James Blumenthal 2004: 355)। অর্থাৎ জ্ঞান-পরিস্থিতি কোনো কার্যকারণের ফল নয়। স্বসংবেদন কোন প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল হয়ে জ্ঞান তৈরি করে না বা কোনোকিছু কারণ হিসেবে জ্ঞান তৈরির পেছনে ভূমিকা রাখে না।

যোগাচারবাদে আত্মসচেতন হবার চেতনাকে চেতনার আলাদা একটি অংশ হিসেবে দেখা হয়। এই অংশ চেতনাকে দেখে বা চেতনা সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু শান্তরক্ষিত আত্মসচেতনতার চেতনাকে চেতনার অভিন্ন প্রকৃতি হিসেবে দেখেছেন। অর্থাৎ যা সচেতন তা একই সঙ্গে আত্মসচেতন।

বৈভাসিকদের সমালোচনা করতে গিয়ে শান্তরক্ষিত স্বসংবেদন সম্পর্কে বলেন। বৈভাসিকদের মত ছিল, আত্মচেতনা নিজে অনভিপ্রায়িক (non-intentional) এবং একটি স্বচ্ছ ক্রিস্টালের মতো। তাদের মতে, দ্রব্যের দিক থেকে চেতনার বস্তু থেকে তা আলাদা। শান্তরক্ষিত বলেন, চেতনা আত্মবাচক এবং চেতনা চেতনার বস্তু থেকে একেবারে আলাদা নয়। শান্তরক্ষিত ন-প্রাসঙ্গিকতার (non-referentiality) পাশাপাশি অভিপ্রায়িকতার (intentionality) ধারণাকেও তাঁর তত্ত্বে যুক্ত করেন। যেমন, আত্মচেতনাকে তিনি দেখেছেন 'সাকার' হিসেবে। ফলে এই ধারণার মাধ্যমে অপরোক্ষ বাস্তবতাবাদ (direct realism) খারিজ হয়ে যায়।

স্বসংবেদনের ধারণাটির সঙ্গে অভিপ্রায়িকতা (intentionality) ও আত্মবাচকতা (reflexivity) গভীর ভাবে যুক্ত। চেতনার অভিপ্রায়িকতা মানে চেতনা সবসময়ই 'কোনোকিছু'র চেতনা। কেউ যদি আশা করে, তবে কোনোকিছু আশা করে, যদি ভয় পায় কোনোকিছুকে ভয় পায়, যদি ইচ্ছা করে কোনোকিছু ইচ্ছা করে– চেতনার সামনে এই 'কোনোকিছু'র অস্তিত্ব থাকাটাই চেতনার অভিপ্রায়িকতা। এই অভিপ্রায়িকতার সঙ্গে আত্মবাচকতার সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ যে মুহূর্তে কেউ 'কোনোকিছু' সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন একই সঙ্গে সেই বিষয়ে আত্মসচেতনা থাকে কিনা? যেমন, যখন কেউ একটি বাঘ দেখছে, একই সঙ্গে সে বাঘ 'দেখা'র চেতনা সম্পর্কে সচেতন কিনা। নাকি বাঘ দেখার চেতনা সম্পর্কে সচেতনাটি চেতনার দ্বিতীয় কোনো ঘটনা। এডমুন্ড হুসার্ল (Edmund Husserl : 27) চেতনার আত্মবাচকতাকে খারিজ করে দেন। তিনি বলেন, কোনোকিছু দেখার ঘটনা আর সেই দেখা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ঘটনা ঘটলেও দুটি আলাদা ঘটনা। এ প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিতের অবস্থান হলো, চেতনা মাত্রই আত্মসচেতন। অর্থাৎ চেতনা যখন কোনোকিছু সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, একই সঙ্গে সেই সচেতনতার মধ্যে আত্মবাচকতা থাকবে। শান্তরক্ষিতের মত অনুসারে, চেতনার আত্মবাচকতার কারণেই প্রপঞ্চ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে।

স্বসংবেদনের সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন জড়িত– চেতনার বস্তু কি চেতনার অতিবর্তী, অর্থাৎ তা কি চেতনাকে ছাড়িয়ে অবস্থান করে? এই প্রশ্নের উত্তরে শান্তরক্ষিতের মত হলো, চেতনার বস্তু চেতনা থেকে আলাদা স্বভাবের নয়। আরেকটি বিষয় এখানে যুক্ত, চেতনার অভিপ্রায়িকতার সঙ্গে যুক্ত বস্তুর অস্তিত্বশীল হবার জরুরত আছে কিনা? অবভাসবাদীদের মত হলো, কোনোকিছুকে চেতনার বিষয় হতে হলে তার অস্তিত্ব থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা কাল্পনিক বিষয়েও সচেতন হতে পারি। এ প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিতের মত হলো, কার্যকারণ শক্তি আছে এমন বস্তুই কেবল বৈধ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে (Jamgön Mipham 2005: 122)। শান্তরক্ষিত বৈধ জ্ঞানের বিষয় হবার যোগ্য বস্তু বলতে সাংবৃতিক সত্তাকেই বুঝিয়েছেন যা কোনো কার্য বা কারণ হিসেবে থাকতে পারে। এসব বস্তুর কার্যশক্তি আছে, যেমন– আগুন পোড়াতে পারে।

এই বস্তুসমূহ তাদের শক্তির বলেই চেতনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। সাংবৃতিক বস্তু যখন সক্রিয় হয় তখন তার একটা ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব তৈরি হয়। একথার ভেতর দিয়ে শান্তরক্ষিত কার্য-কারণ আকারে থাকা বস্তুসমূহের অস্থায়ীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন (Jamgön Mipham 2005: 122)। অবস্তুর সেই শক্তি নেই, যেমনঃ স্থান বা অন্য কোনো কল্পিত ধারণা।

ধর্মকীর্তি ও দিগনাগ অনুসারে, স্বসংবেদনের ধারণা দাঁড়িয়ে আছে চেতনার আত্মবাচক বৈশিষ্ট্যের উপর। 'চেতনার সমীপে উপস্থিতি' ঘটে এই আত্মবাচকতার লক্ষণের কারণেই, চিন্তার তৎপরতা সম্ভব হয়ে ওঠে এর কারণেই।

শান্তরক্ষিতের কাছে স্বসংবেদন নিজের ব্যাপারে সচেতন হওয়া নয়। নিজের ব্যাপারে সচেতন হওয়া মানেই প্রসংগ নির্ভরতা। চূড়ান্ত বিচারে চেতনা একটি অংশহীন সমগ্র। একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি, যদিও আমরা প্রাসঙ্গিক করে জ্ঞান-পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করি। আমরা জ্ঞানকে ভাবি উৎপাদক/উৎপাদিত আকারে। কিংবা প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমাণফল হিসেবে। কিন্তু দিগনাগের বক্তব্য হলো জ্ঞানক্রিয়ার ফল ও জ্ঞানের উপায় আলাদা নয়, এদের ভেতর ভেদ নেই (*প্রমাণসমুচ্চয়*, ৮সিডি, ৯এ)। স্বসংবেদন বলতে দিগনাগ সাকারজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়েছেন। দিগনাগ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে নিয়ে গেছেন তত্ত্বটিকে। তিনি স্বসংবেদনের মতকে চেতনসত্তার অ-প্রসঙ্গ নির্ভরতা ও অভিপ্রায়িকতার স্বভাবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এখানেই দিগনাগ স্মৃতি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান দেন।

বৈভাসিক ও হিন্দু বাস্তববাদীদের মতে জ্ঞান নিরাকার। এই নিরাকরণের ভেতর প্রসঙ্গনির্ভর হয়ে জ্ঞানের সৃজন হয়। ফলে, তাদের মতে চেতনার ভেতর অভিপ্রায়িকতা থাকার দরকার পড়ে না। দিগনাগ এই মতের যে সমস্যাটি চিহ্নিত করেন তা হলো, এই মত স্বীকার করলে কারো চেতনক্রিয়ার অনুবর্তী জ্ঞান থাকবে না। এ থেকেই দিগনাগ স্মরণ-তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। হুসার্লের আভ্যন্তরীণ সময়-চেতনার ফেনমেনোলজি-র পূর্ববর্তী তত্ত্ব এটি।

স্বসংবেদন বিষয়ে শান্তরক্ষিতের তত্ত্ব দিগনাগ ও ধর্মকীর্তির অবস্থান থেকে অনেকখানি আলাদা। মি-ফাম (Mipham) সাকার জ্ঞান ও অভিপ্রায়িকতার ধারণা সমেত শান্তরক্ষিতের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আত্মবাচক চেতনার অস্তিত্ব আছে কেবল প্রথা হিসেবে, সংবৃতি সত্যরূপে। এই সচেতনতা আবশ্যকীয় অস্তিত্ব হিসেবে প্রসঙ্গনির্ভর সচেতনতা নয়। প্রসঙ্গনির্ভর সচেতনতা চেতনা ও প্রতিরূপে বিভক্ত থাকে। আত্মবাচক চেতনায় সাংবৃতিকভাবে অভিজ্ঞতা জ্ঞান আকারে আসে, এ মত পোষণের ভেতর দিয়ে শান্তরক্ষিত সচেতন সত্তাকে অচেতন বা জড়সত্তা থেকে আলাদা করেন। শান্তরক্ষিত বলেন, অন্তর্বর্তী সত্তার (object in-itself) অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া সম্ভব, এমন মতকে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কেননা সচেতন ও অচেতনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

চেতনা উৎপন্ন হয়েছে
যা অচেতন তার বিপরীত প্রকৃতির কোনো কিছু থেকে।
যা জড়ের স্বভাববিশিষ্ট নয়
তা হলো এই চেতনার স্বসংবেদন (*মাধ্যমকলঙ্কার*, ১৬)।

অর্থাৎ চেতনা যে বাহ্যবস্তুকে সনাক্ত করে তা স্বভাবগতভাবে আলাদা নয়। মন যেমন সাংবৃতিক তেমনি চেতনার বস্তুও সাংবৃতিক বা প্রথার ভেতর দিয়ে তৈরি। কারণ, যা চেতন থেকে আলাদা এমন বস্তুর সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক কিভাবে সম্ভব? ন-প্রসঙ্গনির্ভর চেতনা বিষয়ে এই অবস্থান সমর্থন করে যে চেতনা আলোকদীপ্ত, অচেতন থেকে তার ভেদ এটিই যা জ্ঞান-পরিস্থিতি নির্মাণের আবশ্যকীয় অস্তিত্ব। এই আত্মবাচকতাও প্রথানির্ভর (Kennard Lipman 1979: 36)। যেমন কোনো একটি গাড়ি সম্পর্কে চেতনা লাভ করলে এই চেতনা লাভের জন্য প্রথাগতভাবে যাকে গাড়ি বলে সাব্যস্থ করা হয়ে থাকে যার কার্যকারণের শক্তি বিদ্যমান, সেটাই প্রমাণের বস্তু হিসেবে চেতনায় প্রবেশ করবে, তখন সেই গাড়িটিকে জানার অর্থ, গাড়িটিকে জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই জানা বিষয়ে সতেচন হওয়া। এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতা জ্ঞেয় এমন কোনো বিভাজন নেই। উল্লেখ্য গাড়িটিকে মন সনাক্ত করবে একটি বর্জন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অর্থাৎ যা গাড়ি নয়, তাকে বাদ দিয়ে। এখানে গাড়িটিকে দেখার মানের ভেতর আছে সচেতনতার মানে। এটাই ন-প্রাসঙ্গিক চেতনা।

অর্থক্রিয়াত্ব তত্ত্ব

সাংবৃতিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষত্ব হলো তার কার্যকারণগত ফলপ্রসূতা। শান্তরক্ষিতের এই অবস্থান সম্পর্কিত তত্ত্বই হলো অর্থক্রিয়াত্ব তত্ত্ব। এই তত্ত্ব শান্তরক্ষিত তাঁর *মাধ্যমকালঙ্কার* গ্রন্থে উপস্থাপন করেন তার প্রধান সন্ধর্ভটি প্রতিষ্ঠিত করার পর। সেটি ছিল এভাবে যে, সমস্ত বিশেষ সত্তা (বিশেষ বস্তু, মন, স্থান-কাল, স্থুল বস্তু ইত্যাদি) না-এক না-বহু, সেকারণে তাদের কোনো স্বভাব (সারসত্তা) নেই। শান্তরক্ষিত তাঁর *মাধ্যমকালঙ্কার*-এ বলেন,

কেবল চূড়ান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আওতায় না আনা পর্যন্ত
যেসব প্রপঞ্চের ব্যাপারে সম্মত হওয়া যায়,
সে সব প্রপঞ্চ যার উদ্ভব ও বিলয় আছে এবং সে সব যাদের কার্য করার
সামর্থ আছে
তাদেরকেই সাংবৃতিক স্বভাবের বলে জানা যায় (*মাধ্যমকলঙ্কার*, ৬৪)।

শান্তরক্ষিত সংবৃতি সত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করেন: ১) যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যাদের ব্যাপারে সম্মত থাকা যায়, ২) স্বস্বভাব নেই এমন সত্তা যাদের কার্য করার সামর্থ আছে, ৩) যার চূড়ান্ত বিভক্তি চলে না, ৪) যার উদ্ভব ও বিলয় আছে। এখানে শান্তরক্ষিত কেবল প্রকৃত প্রাতিভাসিক সত্যের

কথা বলেছেন। কমলশীল যেভাবে প্রকৃত ও অপ্রকৃত প্রাতিভাসিক সত্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন (যেমন গাছ, ও একটি গাছের প্রতিবিম্ব বা মানুষ, ও স্রষ্টারূপে ঈশ্বর), শান্তরক্ষিত এখানে সেই পার্থক্য না করলেও অনুমেয় যে, তিনি প্রকৃত সংবৃতি সত্যের কথাই বলেছেন। তিনি উল্লেখিত সূত্রটির ভাষ্য দিতে গিয়ে প্রকৃত সংবৃতি সত্য কথাটি উল্লেখ করেন।

সংবৃতি সত্য কেবল নাম বা লেবেল নয়, বরং শব্দগুলির সত্তাগত রেফারেন্স আছে, যারা অংশ দিয়ে তৈরি। যে অংশগুলির কারণিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তার সাংবৃতিক সত্তা তৈরি হয়। যেমন, একটি গাড়ি যার চাকা, আসন ইত্যাদি অংশকে আলাদা করলে তাকে আর গাড়ি বলা যাবে না। অর্থাৎ যা বিভক্ত করা হলে অস্তিত্ব হারায়।

স্বস্বভাব বা সারসত্তা না থাকলেও কোনো একটি কারণের কার্যকারিতা আছে। ব্যবহারিক দিক থেকে এদের জরুরতকে স্বীকার করেছেন শান্তরক্ষিত। আবার, জ্ঞানের বা চেতনার বস্তু হিসেবেও এদেরকে তিনি বৈধ বস্তু বলে স্বীকার করেছেন। শান্তরক্ষিত পরবর্তী দুটি শ্লোকে বলেন,

> তাদের সম্পর্কে সম্মত হওয়া চলে কেবল অব্যাখ্যাত অবস্থায়,
> যেহেতু তা পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর করে,
> পরবর্তী ফলের উদ্ভব ঘটে
> কারণের সঙ্গেই সঙ্গতি রেখে (*মাধ্যমকলঙ্কার*, সূত্রঃ ৬৫)।
> সুতরাং (কেউ যদি দাবি করেন) সাংবৃতিক বাস্তবতার ভিত্তি হিসেবে
> কোনো (সত্যিকার) কারণ নেই, তাহলে সেটা ভুল হবে।
> যদি উপযুক্ত ভিত্তিটি বাস্তব হয়,
> তাহলে তা বলো (যুক্তি সহকারে)। (*মাধ্যমকলঙ্কার*, সূত্রঃ ৬৬)

এই স্তবকগুলিতে শান্তরক্ষিত ব্যাখ্যা করেন যে, সাংবৃতিক সত্তার অস্তিত্ব আছে কারণিকভাবে এবং ক্রিয়াত্মকভাবে, যদিও তা বিভক্ত হবার যোগ্য নয়। অর্থাৎ এই বাস্তবতা একই সঙ্গে শূন্যস্বভাবের আবার কার্যক্ষম।

অর্থক্রিয়াত্ব তত্ত্বের সঙ্গে স্বসংবেদনের তত্ত্বে যোগসূত্রতা এই যে, সাংবৃতিক সত্যকে জ্ঞানের বৈধ বস্তু হিসেবে স্বীকার করে শান্তরক্ষিত স্বসংবেদন তত্ত্বের ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন। অন্যদিকে, সংবৃত বস্তুকে প্রথানুগ সত্তা বলে তিনি তাঁর মাধ্যমিক অবস্থানকেও সংহত করেছেন। শান্তরক্ষিত স্বসংবেদনের তত্ত্বে জ্ঞানপরিস্থিকে কার্য-কারণের বাইরে রেখে চেতনার অভিপ্রায়িকতা ও আত্মবাচকতা দিয়ে সচেতনতা ও জ্ঞানের অনন্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আসন্ন পরমার্থ সত্য ও অন্তর্বর্তী পরমার্থ সত্য

মাধ্যমিকদের কাছে পরমার্থ সত্য হলো, সত্তার কোনো অন্তঃপ্রকৃতি বা স্বভাব নেই। অর্থাৎ সকল পারিপার্শ্বিক সত্তাই শূন্য স্বভাবের। যে পরিপার্শ্বের মধ্যে আমরা বাস করি, যে বস্তুপ্রপঞ্চকে আমরা চারপাশে দেখতে পাই বা যা-কিছু আমাদের চেতনার বিষয় তার সব কিছুই যৌক্তিক বিচারে শূন্য– এই প্রজ্ঞার উপলব্ধি আমাদেরকে সংসারে আটকে থাকার মোহ থেকে মুক্ত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সবেমাত্র সাধনা শুরু করেছে বা যার জ্ঞান অপ্রতুল তার সামনে যদি এই সত্য উপস্থাপন করা হয় সে অবশ্যই বিভ্রান্তির কবলে পড়বে এবং বিচলিত বোধ করবে। কেননা যে বাস্তবতাকে সে এতদিন চূড়ান্ত সত্য জেনে এসেছে তাকে শূন্য হিসেবে জানায় মানসিক আঘাতের সম্ভবন অমূলক নয়। অপক্ব মনের সামনে চূড়ান্ত সত্য উপস্থাপনকে *মূলমাধ্যমিক-শাস্ত্র* নিম্নরূপ উপমা দিয়ে উপস্থাপন করেছে: “This is like catching snake unskillfully and practicing the vidya-mantra without competence" (Jamgön Mipham 2005: 126)। এই সংকট কাটানোর প্রয়োজনেই শান্তরক্ষিত চূড়ান্ত সত্যকে জানার দুটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন।

পরমার্থ সত্যকে তিনি আসন্ন পরমার্থ সত্য ও অন্তর্বর্তী পরমার্থ সত্যে বিভক্ত করেছেন। আবার, উভয়ের ভেতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও করেছেন।

জামগন মি-ফাম শূন্যতার সমস্যাকে নঞর্থক অস্বীকার রূপে আলোকপাত করেন। সাধারণভাবে মাধ্যমিকদের বিবেচনা হলো নেতিবাচকতার গূঢ় অবস্থানে না থাকা, সেকারণে তাঁরা শূন্যতাকে বাস্তব বলে গণ্য করেছেন। মি-ফাম এই সমস্যাকে বলেছেন, কিভাবে লাফ দিয়ে নিজের ছায়াকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় (Kennard Lipman 1979: 101-102)। এখানে ছায়া মানে অস্বীকারের ছায়া। অর্থাৎ শূন্যতাকে অস্বীকার করে, আবার এই অস্বীকারের ছায়াটাকেই ডিঙিয়ে যাওয়া।

পরমার্থ সত্যের আলোচনায় গোড়াতেই দুটি বিষয় উল্লেখ্য, প্রথমত: ভারতীয় দর্শনে সদর্থক ও নঞর্থক বলতে কোনো বর্ণনা বা বচনকে স্বীকার বা অস্বীকার বোঝানো হয় না। অস্বীকার বলতে মাধ্যমিকগণ কোনোকিছুর সত্তাগত তাৎপর্যকে অস্বীকার করা বুঝিয়ে থাকেন। অভিজ্ঞতার ভেতর পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির যে ফেনমেনলজি, তারই ভেতর দিয়ে এই অস্বীকার অর্থপূর্ণ হয়। তারা সাংবৃতিক সত্তা হিসেবে বিশেষ সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আর এই উপস্থিতির অভাবই অস্বীকার। দ্বিতীয়ত: একটি সমস্যা এই যে, পারিপার্শ্বিক সত্তার স্বভাব সম্পর্কিত যে সংস্কার অনাদিকাল ধরে বহমান তা কিভাবে এড়ানো যাবে। একারণে শূন্যতাকে তাঁরা বুঝতে চেয়েছেন সত্তার উন্মুক্ততা রূপে (Kennard Lipman 1979: 101)| অর্থাৎ শূন্যতার জ্ঞানের ভেতর দিয়ে এই উন্মুক্ততার ভেতর কেউ মুক্ত হতে পারে কেবল। মি-ফাম বলছেন, নিজের ছায়াকে লাফ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া যাবে যদি প্রবেশ করা যায় দু'প্রকার সত্যের সন্মিলনের ধারণায়।

মি-ফাম শান্তরক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকদের মতকে পরস্পর সম্পর্কিত করে বুঝতে চেয়েছেন। স্বাতন্ত্রিকদের পথ হলো পরমার্থ সত্যের অবস্থান থেকে বিশেষ সত্তাসমূহকে দেখা। অর্থাৎ পরমার্থের সত্য মোতাবেক বিশেষ সত্তাসমূহের কোনো

অস্তিত্বই নেই। এটাই তাঁদের প্রজ্ঞার দৃষ্টি। যে দৃষ্টি এভাবে দেখার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হয়। এতে স্বাতন্ত্রিকরা শুরুতেই বোঝাপড়া করে নেন দু'প্রকার সত্যের ভেতর ভেদরেখা টানার ভেতর দিয়ে। শুরুতেই সত্যকে এভাবে দেখার মধ্যে পরমার্থ সত্যের আসন্ন গড়নটি তৈরি হয়। অন্যদিকে, প্রাসঙ্গিকগণ সত্যকে বিভক্ত না করে একটি ঐক্যধর্মী অবস্থান থেকে পরমার্থ সত্যকে উপলব্ধি করতে চান। পরমার্থ সত্যের এটাই অন্তর্বর্তী রূপ।

পরমার্থ সত্য উপলব্ধির প্রথম পদ্ধতিটি ক্রমাগ্রসরমান এক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। এতে চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যায় একটি পরম্পরা মেনে। অন্যদিকে, সত্যকে একক মূল্যের অধীনে এনে চূড়ান্ত সত্যকে উপলব্ধি করার পদ্ধতিটি ত্বরিৎ। এতে ক্রমাগ্রসর হবার ব্যাপার নেই। চূড়ান্ত অবস্থান থেকেই কেবল সত্যকে একসঙ্গে দেখা হয়। উল্লেখ্য যে, এই ক্রমানুগ ও ত্বরিৎ হবার বিষয়টি বোধি লাভের ক্রমানুগ ও ত্বরিৎ পদ্ধতি নয়। দুটোই পরমার্থ সত্যের দু'ধরনের বয়ান।

বিশেষ সত্তা সমূহের প্রতি মানুষের আবেশ বা আকর্ষণ থাকে। আসন্ন সত্যের পদ্ধতিতে সত্যকে উপলব্ধির ভেতর দিয়ে সেই আবেশ ধ্বংস হয়। অতঃপর পরম সত্যের অন্তর্বর্তী দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। শান্তরক্ষিত বলেন,

> সুতরাং বাস্তবে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত
> সত্তা বলে কিছু নাই।
> সে কারণে, তথাগতরা সমস্ত প্রপঞ্চের
> অনুৎপাদন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন (*মাধ্যমকালঙ্কার*, ৬৯)।
>
> যেহেতু তারা চূড়ান্ত সত্যের সদৃশ,
> কেউ কেউ এই 'অনুৎপাদ'কে বলেন চূড়ান্ত সত্য,
> কিন্তু বাস্তবিক তা (চূড়ান্ত সত্য)
> সমস্ত মৌখিক বাগাড়ম্বরের সঞ্চয় থেকে মুক্ত (*মাধ্যমকালঙ্কার*, ৭০)।

চূড়ান্ত বিচারে কেউই বিশেষ সত্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে সক্ষম নন। অভ্যাসবশে তারা অনুৎপন্ন বস্তুকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করেন কিন্তু তাদের ভাষার সমস্ত বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও সেসবের কোনো অস্তিত্ব নেই। শান্তরক্ষিতের মতে, পরমার্থ সত্যে পৌঁছাবার উভয় পদ্ধতির ভেতর আসলে যৌক্তিক কোনো স্ববিরোধ নেই।

তথ্যপঞ্জী

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (২০১১), *তিব্বতে সওয়া বছর*, (ভূমিকা ও সম্পাদনা: যতীন সরকার) রুব্বু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা-১০০০

Alaka Chattopadhyaya (2011), *Atisa and Tibbet*, Motilal Banarsidas Publishers Private Limited, Delhi

Dalai Lama (1962), *My Land and My People*, McGraw-Hill, 1962

Edmund Husserl (1964), The Idea of Phenomelogy, (trans by Lee Hardy) Kluwer academic Publishers, London

James Blumenthal (2004), *The ornament of the middle way: a study of the madhyamaka thought of Santaraksita*, Snow Lion Publications, New York

Jamgön Mipham (2005), *The adornment of the middle way Shantaraksita's Madhyamakalamkara*, (Translation by Padsmakara translation Group), Shambhala, Boston & London

Kennard Lipman (1979), *A study of Santaraksita's Madhyamakalamkara*, Saskatoon, Canada

Lama Tsong Khapa (1983), *Atisa and Buddhism in Tibet*, (Compiled and Translation: Doboom Tulku and Glenn H. Mullin), Tibet House, New Delhi

Lama Thubten Kalsang (1974), *Atisa: a biography of renowned Buddhist sage*, The Social; Science Press, Bangkok

Richard Sherburne, S.J. (2000), *The complete works of Atisa Sri Dipamkara Jnana*, Aditya Prakasana, New Delhi

Sri Sarat Chandra Das (1893), *Indian pandits in the land of snow*, Baptist Mission Press, Calcutta

Sum-pa (1908), *dPag-bsam-ljon-bzan* (ed. by S. C. Das), Calcutta, in Alaka Chattopadhyaya (2011: 62),

Taoshobuddha (2010), *Atisha: The Tibetan Buddhist Master*, Taoshobuddha Meditations Team, India